প্রবন্ধ ২

ধর্মীয় নিষ্ঠার পাশাপাশি বহুবর্ণ উৎসব

জহর সরকার

১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬, ০০:০০:৫৬

প্রতি বছর মিলাদ-উন-নবি দিনটি আরও একটা ছুটির দিন। কিন্তু কেন ছুটি, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। রবিউল আওয়াল মাসের দ্বাদশ দিনটির আন্তর্জাতিক পরিচিতি 'মলিদ' নামে, এই দিনেই নবি মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত। দিনটির উদ্‌যাপন নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে: রক্ষণশীল মুসলিমরা— সালাফি ও ওয়াহাবিরা— এটি পালন করেন না। আইএস-এর মতো কট্টরপন্থীরা, যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য চরমপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামের 'শোধন', তারাও এই দিনটির বিরুদ্ধে। সৌদি আরবেও এই দিনটির পালন নিষিদ্ধ।

তবে রক্ষণশীল সুন্নি সহ সারা বিশ্বের অগণিত মুসলমান এই দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকেন। এমনকী ক্রমশ চরমপন্থী হয়ে-ওঠা পাকিস্তানেও এই সরকারি ছুটির দিনটি পালিত হয় সাড়ম্বরে, ইসলামাবাদে ৩১টি গান-স্যালুটের মাধ্যমে। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতেও ২১টি গান-স্যালুটের মাধ্যমে শুরু হয় উদ্‌যাপন। ইসলামের স্বঘোষিত পরিত্রাতারা এ দিনটি পালনের অনুমতি কতটা দেবেন তা অবশ্য বলা শক্ত, কারণ তাঁরা নানা বিষয়ে বস্তাপচা ফতোয়া চাপিয়ে থাকেন। ভারত ও বাংলাদেশে শিয়া ও সুন্নি দুই সম্প্রদায়েরই লক্ষ লক্ষ মুসলিম হজরত মহম্মদের জন্মদিনটি প্রথা মাফিক পালন করে থাকেন। তবে তার মধ্যে আবার আছে 'দেওবন্দি' সম্প্রদায় ও ভিন্নমতাবলম্বী 'আহমদিয়া' গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ, যাঁরা এই দিনটি উদ্‌যাপনের বিরোধী।

কথ্য আরবি ভাষায় 'মলিদ' শব্দের অর্থ জন্মদিন। ইতিহাসে যে চার জন খলিফার কথা আছে, তাঁরা এটি পালন করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু তখনও তা জনগণের উৎসব ছিল না। নানা দেশে 'মিলাদ-উন-নবি' নানান স্থানীয় নামে প্রচলিত, যেমন আফ্রিকার সোয়াহিলি-তে 'মওলিদি', মালয়ে 'মালিদুর রসুল', তুরস্কের ভাষায় 'মেলভিদ-ই শরিফ'। অন্য অনেক ধর্মের মতোই এখানেও প্রবক্তার জন্মদিনটি এই দিনেই কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা মনে করেন, হজরত মহম্মদের জন্ম আরও একটু পরে। এই মতান্তর অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বের অধিকাংশ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষই বিশ্বাস করেন যিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্রিসমাস ইভ-এর দিনটিতে, অন্য দিকে প্রাচ্যের কিছু চার্চ যিশুর জন্মদিন পালন করেন ৬ জানুয়ারি। আবার অনেকেরই বিশ্বাস, দুটো দিনেরই কোনও বিশেষ প্রমাণ নেই। জন্মাষ্টমীর মতোই এ ক্ষেত্রেও পুণ্য জন্মক্ষণটি মধ্যরাতের পরে, আর তাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ সারা রাত প্রার্থনায় কাটান। ইতিহাস বলে, 'মলিদ' বা 'মিলাদ'কে প্রধান একটি উৎসব করে তুলেছিলেন ফতিমিদ খলিফারা, ক্রিসমাসের প্রত্যুত্তর হিসেবে। নবির প্রয়াণের তিন শতাব্দী পরের ঘটনা সেটা। শিয়া-প্রভাবিত ইতিহাস এবং মশাল নিয়ে শোভাযাত্রা বা ধর্মস্থান সাজানোর মতো শিয়া প্রথাগুলির জন্যই আরবের কঠোরভাবাপন্ন সুন্নিরা শুরু থেকেই এই দিনটি পালনের বিরোধিতা করেন। তা সত্ত্বেও, দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অধিকাংশ সুন্নি মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের মানুষই এই দিনটি পালন করে আসছেন। ধর্মের কূট তর্কবিতর্ক যদিও সব সময়ই বলবৎ ছিল।

অন্যান্য অনেক জায়গার মতোই, ভারতেও মিলাদ-উৎসব দুই ইদের উৎসবের মতো নয়। অধিকাংশ জায়গাতেই এই দিন সন্ধ্যায় সবাই প্রার্থনায় কাটান— পুরুষরা মৌলবিদের নেতৃত্বে, এখন নারীরাও নিজেদের সম্মিলিত প্রার্থনা শুরু করেছেন। ঐতিহ্য অনুসারে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ-প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। উনিশ শতকের উপনিবেশ-জমানার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই অনুষ্ঠানকে বলা হত 'বারা ওয়াফাত' বা দ্বাদশ রাত্রি। এই রাতে 'নবির আত্মার উদ্দেশে ফতিহা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসায় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয়।' রিপোর্টে আছে, এই দিনে ভারতের নানা জায়গায় কদম রসুল নামে 'পদচিহ্নের অবয়ব অঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ড' প্রদর্শিত হয়েছিল, মানুষ প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদন করেছিলেন। ধর্মনির্বিশেষে নিরক্ষর ভারতবাসীর আচরিত প্রতীকী রীতিগুলোও যে একই রকমের, সেটা বুঝতে পারা যায়। যখন দেখি মুসলিম গৃহস্বামী পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড পেতে দিচ্ছেন অনেক মানুষ তার ওপর বসে বা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবেন বলে, কিংবা আগরবাতি জ্বালছেন বা প্রার্থনাকারীদের ওপর গোলাপজল ছেটাচ্ছেন, অন্যান্য ভারতীয় ধর্মের একই রকম প্রথাগুলি মনে পড়ে।

লাউডস্পিকারের দৌলতে ছোট আকারের বা বাড়িতে অনুষ্ঠিত মিলাদ-প্রার্থনাগুলিও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। ‘পাক কথা’ বা পবিত্র বাক্যেরা যত দূর পৌঁছবে, তত পুণ্য নিশ্চিত। হাসির মল্লিকের বর্ণনায় পাই, বাঙালি মুসলিমরা এ রাতে পূর্বপুরুষের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করেন, যেমন হিন্দুরা করেন পিতৃতর্পণে। তিনি আরও লিখেছেন, মৌলবিরা পাঠ শেষ করলে সকলে সমস্বরে সুরে-কথায় নবির জয়গান করেন। এর পর গ্রামবাসীদের মধ্যে বাতাসা বা মিষ্টি বিতরণ করা হয়, মৌলবিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। অনেক গ্রামগঞ্জ বা শহরেও মুসলিমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে, সবুজ পাগড়ি পরে, পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোন। ধর্মস্থান ও রাস্তাঘাট সাজিয়ে তোলা হয়। হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে এই ‘জলুস’ বা দীর্ঘ শোভাযাত্রার রীতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শহরগুলোতে এই নিয়ে অঘোষিত প্রতিযোগিতাও চলে। ঢাকা বা চট্টগ্রামের ‘জশ্নে জলুস’-এ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ তো রেকর্ড। লক্ষ লক্ষ মানুষ সবুজ পতাকা-ফেস্টুন নিয়ে বেরোন, ভ্যানের ওপর মাইক্রোফোন-হাতে থাকেন গায়ক বা ধর্মগ্রন্থপাঠকারীরা। উপমহাদেশের অনেক জায়গায় ভিড় টানতে আকর্ষক গান-প্রার্থনার আয়োজন হয়। পাকিস্তানে বহু মানুষ এই সময় সন্ধেবেলা বাজি পোড়ান, আমাদের দিওয়ালি-দশেরার মতোই।

এই দিনটির উৎসবমুখর কার্নিভাল-প্রতিম চরিত্রটি নিয়ে গোঁড়া নৈষ্ঠিকরা শঙ্কিত। তবু, ভারতের সব ধর্মগুলিতেই আনন্দ-অনুষ্ঠানের রীতির চল— কাওয়ালি, ভজন, নৃত্য সহকারে কীর্তন, বহুবর্ণ জলুস, চিৎকৃত মাইক্রোফোন ও মেলার উপস্থিতি। তন্নিষ্ঠ প্রার্থনা, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও সুগভীর ধর্মভাবের পাশেই এদেরও চিরকালীন অবস্থান। ধর্মের নামে বৃহৎ জনসমাবেশের অন্য তাৎপর্যও আছে। এমন প্রচুর জনমানুষও অংশ নেন, যাঁরা হয়তো ততটা ধর্মভাবাপন্ন নন। সামাজিক বিভেদরেখাগুলি কিছুটা হলেও মোছে, সৌভ্রাত্র দৃঢ়তর হয়— হোক না তা ঈশ্বরের নামেই।